নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

পর্যালোচনা

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩

পর্যালোচনা

BLAST

CHRI
Commonwealth Human Rights Initiative

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

ব্লাস্ট ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি জাতীয় আইন সেবা ও মানবাধিকার সংগঠন। সারাদেশে ১৯টি জেলা কার্যালয় ও আইন সহায়তা ক্লিনিকের মাধ্যমে ব্লাস্ট আইন সহায়তা প্রার্থীদের নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত আইন সহায়তা দিয়ে থাকে। ব্লাস্ট তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার সচেতনতা বৃদ্ধি, আইনী পরামর্শ এবং মামলা ও মধ্যস্থতা পরিচালনা করে। অধিকার ও আইনী সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এডভোকেসির অংশ হিসেবে ব্লাস্ট জনস্বার্থে মামলাও পরিচালনা করে। বিস্তারিত জানার জন্য লগ ইন করুন: www.blast.org.bd

© বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর ২০১৫

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ: এক্সিকিউট

মুদ্রণ: প্রিন্টেক

প্রকাশনায়:
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
প্রধান কার্যালয়
১/১, পাইওনিয়ার রোড, কাকরাইল, ঢাকা ১০০০
টেলিফোন: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭০-২, ৮৩১৭১৮৫
ফ্যাক্স: +৮৮(০২) ৮৩৯১৯৭৩
ই-মেইল: mail@blast.org.bd
ওয়েব: www.blast.org.bd
ফেসবুক: www.facebook.com/BLASTBangladesh

গ্রন্থস্বত্বগত অবস্থান

এই প্রকাশনাটির অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ অবাধে পর্যালোচনা, পরিমার্জনা, পুনর্মুদ্রণ এবং অনুবাদ করা যেতে পারে, কিন্তু তা কোনভাবেই বিক্রয়ের জন্য বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। এই প্রকাশনার কোন পরিবর্তনে ব্লাস্টের অনুমোদন আবশ্যক এবং প্রকাশনাটির যেকোন তথ্য, উপাত্ত ব্যবহারে ব্লাস্টের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হবে। যেকোন অনুসন্ধানের জন্য ই-মেইল করুন: publication@blast.org.bd

মুখবন্ধ

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর পর্যালোচনার ফলাফল একত্রিত করে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ও কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ ইনিশিয়েটিভ (সিএইচআরআই) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী মো: তাজুল ইসলাম-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। পর্যালোচনার প্রক্রিয়ায় বিভাগীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা আয়োজনে অবদান রাখেন ব্লাস্টের আইন উপদেষ্টা এস এম রেজাউল করিম ও প্রকল্প কর্মকর্তা মবিনুল মুল্‌ক। বিভাগীয় পরামর্শ সভা আয়োজনে সহযোগিতার জন্য ব্লাস্টের সিলেট, খুলনা, বরিশাল ও রাজশাহী ইউনিট সমন্বয়কারীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঁচ বিভাগের বিজ্ঞ আইনজীবী, আইনের শিক্ষকগণের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে এই প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করায় আমরা তাদের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা ও সম্পাদনার জন্য আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সদস্য আইজ্যাক রবিনসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. রেদওয়ানুল হক এবং সিএইচআরআই-এর পুলিশ রিফর্ম কর্মসূচির সমন্বয়কারী দেবীকা প্রাসাদ-এর প্রতিও আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদ।

সারা হোসেন
অনারারী নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

সূচিপত্র

১. পটভূমি ১

২. নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ ৩

২.১ 'নির্যাতন', 'হেফাজতে মৃত্যু' ও 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র সংজ্ঞা

২.২ নির্যাতনের ফলাফল এবং শাস্তি

২.৩ অভিযোগ ও মামলা দায়ের

২.৪ নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত

২.৫ অভিযোগকারীর সুরক্ষা

২.৬ নির্যাতনমূলক অপরাধের বিচার

২.৭ বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত অপরাধ এবং বহিঃসমর্পন

৩. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর প্রয়োগ ৭

৪. পর্যালোচনার ফলাফল ৮

৪.১ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর সংজ্ঞা

৪.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র সংজ্ঞা

৪.৩ অভিযোগ দায়ের

৪.৪ তদন্ত

৪.৫ বিচার

৪.৬ শাস্তি

৪.৭ ক্ষতিপূরণ

৪.৮ সাক্ষী সুরক্ষা

৪.৯ অতিরাষ্ট্রীক এখতিয়ার

৪.১০ আপিল এবং রিভিশন

৫. সুপারিশ ও উপসংহার ১৩

৫.১ সুপারিশসমূহ

৫.২ উপসংহার

পটভূমি

নির্যাতন থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই আইনের বিধান অনুযায়ী যথাযথ আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। যেকোন ধরনের নির্যাতন বা বেআইনী শাস্তি মানুষের জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ক্ষুন্ন করে যা মৌলিক মানবাধিকারের লঙ্ঘন। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'প্রত্যেক মানুষের জীবন, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে' এবং ৫নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোন মানুষকে যন্ত্রণা বা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না বা অনুরূপ আচরণ করা যাবে না'। একইভাবে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদের ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কাউকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড বা অনুরূপ কোন আচরণ করা যাবে না'। এই অধিকারগুলোকে বাংলাদেশের সংবিধানেও মৌলিক অধিকার হিসেবে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদের সাথে একাত্ম হয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের ৩১, ৩২ এবং ৩৫(৫) অনুচ্ছেদগুলোতে জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার এবং নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড বা অনুরূপ কোন শাস্তি থেকে নাগরিকদের মুক্ত থাকার অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে।

এভাবে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় আইনে এই অধিকারগুলোকে নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যা জরুরি অবস্থা, জাতীয় নিরাপত্তা বা অন্য কোন কারণে রহিত করা যাবে না। সারাবিশ্বে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড বা শাস্তির বিরুদ্ধে চলমান সংগ্রামকে আরো ফলপ্রসু করতে ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ 'নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন' (CAT) গ্রহণ করে। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর বাংলাদেশ নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের পক্ষভূক্ত হয়। নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর আচরণ প্রতিরোধ এবং শাস্তি প্রদান বিষয়ে 'সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা' এবং 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক সনদ'- এর থেকে অনেক বিস্তারিত বিধি-বিধান নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, কনভেনশনের প্রত্যেক পক্ষরাষ্ট্র নির্যাতনমূলক সকল কার্যক্রমকে তাদের ফৌজদারী আইনে অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী পর্যাপ্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।[১]

নিষ্ঠুর এবং লাঞ্ছনাকর আচরণ বা শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের নাগরিকগণ প্রায়শই এই ধরনের নির্যাতনের শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার বা আটক করার পর হেফাজতকালীন সময়ে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায়ের ক্ষেত্রে এই ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ উঠে।

১ অনুচ্ছেদ ৪(২), নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন

যদিও ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৩০ ধারায় বেআইনী গ্রেফতার এবং আটকের বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষা রয়েছে। তবুও ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারার আওতায় পরোয়ানা ছাড়া গ্রেফতার ও ১৬৭ ধারার আওতায় অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে রাখার ক্ষমতা অপব্যবহারের ফলে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এবং নির্যাতন বা নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ড থেকে মুক্ত থাকার মত মৌলিক অধিকারও লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য[২] মামলায় মতামত দেয় যে, এই ধারাগুলো সংবিধানের সংগে কিছুটা অসংগতিপূর্ণ এবং এগুলোর সংশোধন প্রয়োজন। এই মামলার রায়ে হাইকোর্ট বিভাগ ছয় মাসের মধ্যে এই অসংগতিসমূহ দূর করার জন্য সাত দফা সুপারিশ প্রদান করে এবং সরকারকে আইন সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছে। তাছাড়া এই ধারাগুলোর আওতায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করতে হাইকোর্ট ১৫ দফা নির্দেশনাও প্রদান করেছে।

সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং আদালতের সিদ্ধান্ত থাকা সত্ত্বেও এই সুরক্ষাসমূহ সবসময় কাজে আসে না, ফলে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো বিফলে যাচ্ছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। যেমন, ২০১৩ সালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা ৭২ জন বিচার বহির্ভূত হত্যার শিকার হয়।[৩] এই ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে একটি পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়নে নাগরিক সমাজের সদস্য এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলো দাবী জানিয়ে আসছে। তাছাড়া নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের আওতায় নির্যাতনমূলক সকল কর্মকান্ডকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে আইন প্রণয়নের বাধ্যবাধকতা এই দাবীকে আরো শক্তিশালী করে। সামাজিক এই প্রেক্ষিতে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নির্যাতনমূলক সকল কার্যক্রমকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করতে গত ৫ মার্চ ২০০৯ জাতীয় সংসদে 'বেসরকারী সদস্য বিল' হিসেবে একটি খসড়া বিল উত্থাপিত হয়[৪]। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদ গত ২৭ অক্টোবর ২০১৩ 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩' পাস করে।

নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এর ত্রুটি বিশ্লেষণ করে সীমাবদ্ধতাসমূহ চিহ্নিত করতে এবং আইনটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সুপারিশমালা প্রদান করতে ব্লাস্ট একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনার পাশাপাশি এই আইনের পর্যালোচনা সম্পর্কে বিভাগীয় পর্যায়ে ৫টি পরামর্শ সভা[৫] আয়োজন করেছে যেখানে আইনজীবী, আইনের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

২ ব্লাস্ট ও অন্যান্য বনাম বাংলাদেশ ও অন্যান্য, ৫৫ ডিএলআর (এইচসিডি) (২০০৩) ৩৬৩
৩ http://greenwatchbd.com/504-violence-deaths-72-extrajudicial-killings-53-disappearances-in-2013/
৪ Khan, Saira Rahman, *How to kill a pro-people law*, New Age, 26 March 2015
৫ ঢাকা (২৯ নভেম্বর ২০১৪), সিলেট (২৮ ফেব্রুয়ারী ২০১৫), বরিশাল (১১ এপ্রিল ২০১৫), খুলনা (২৭ মার্চ ২০১৫) এবং রাজশাহী (১৬ মে ২০১৫)

নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ -এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

বাংলাদেশে 'নির্যাতন' এবং 'হেফাজতে মৃত্যু'র আইনগত সংজ্ঞা প্রদানের প্রথম প্রয়াস এই আইনে দেখা যায়। তাছাড়া এই আইনে অপরাধের শিকার বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের কার্যকর সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনেরও উপায় খোঁজা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের, তদন্ত প্রক্রিয়া এবং শাস্তি প্রদানের বিধি-বিধান সম্পর্কেও আইনে বিস্তারিত বলা হয়েছে। নিম্নে আইনটির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহের সংক্ষিপ্তসার আলোচনা করা হল।

২.১ 'নির্যাতন', 'হেফাজতে মৃত্যু' ও 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র সংজ্ঞা

নির্যাতন শব্দটি ১৯৭২ সালে প্রথম বাংলাদেশে আইনের ভাষায় প্রবেশ করে এবং সংবিধানের ৩৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্যাতন নিষিদ্ধ। যদিও সংবিধান বা অন্য কোন আইনে নির্যাতনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩-এ প্রথম নির্যাতনের সুনির্দিষ্ট আইনগত সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। ২(৬) ধারা অনুসারে;

"'নির্যাতন' অর্থ কষ্ট হয় এমন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন; এতদ্ ব্যতীত-

ক) কোন ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি আদায়ে;

খ) সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে;

গ) কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার মাধ্যমে অপর কোন ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো;

ঘ) বৈষম্যের ভিত্তিতে কারো প্ররোচনা বা উস্কানি, কারো সম্মতিক্রমে অথবা নিজ ক্ষমতা বলে কোনো সরকারি কর্মকর্তা অথবা সরকারি ক্ষমতাবলে;

-এইরূপ কর্মসাধনও নির্যাতন হিসাবে গণ্য হইবে।"

এই আইনের ২(৭) ধারায় 'হেফাজতে মৃত্যু'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে;

"'হেফাজতে মৃত্যু' অর্থ সরকারি কোন কর্মকর্তার হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু; ইহা ছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোন ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোন মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে।"

আবার **'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'** অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারি কোন সংস্থাকে বুঝাবে।[৬]

২.২ নির্যাতনের ফলাফল এবং শাস্তি

আইন অনুযায়ী নির্যাতনের সম্ভাব্য শাস্তি নূন্যতম পাঁচ বছর কারাদণ্ড অথবা ৫০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা। আদালতের নিজস্ব বিবেচনায় যেকোন একটি অথবা উভয় শাস্তি প্রদান করতে পারেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ভিকটিম ২৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।[৭] আর যদি নির্যাতনের ফলে মৃত্যু হয় তখন শাস্তি আরো কঠোর, সেক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কমপক্ষে এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। নির্যাতনের কারণে মৃত্যু হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ভিকটিম ক্ষতিপূরণ বাবদ দুই লক্ষ টাকা পাবেন।[৮] নির্যাতনের মত দুষ্কর্মে সহায়তাকারীগণ, নির্যাতন সংগঠন করতে যারা চেষ্টা করেছে, সাহায্য বা প্রলোভন দিয়েছে বা নির্যাতনের ষড়যন্ত্র করেছে তাদের জন্যও এই আইনে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এজন্য প্রত্যেক অভিযুক্ত ব্যক্তি দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা নূন্যতম ২০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর্থিক জরিমানা অথবা ক্ষতিপূরণের টাকা দণ্ড ঘোষণার ১৪ দিনের মধ্যে অবশ্যই বিচারিক আদালতে জমা দিতে হবে।

২.৩ অভিযোগ ও মামলা দায়ের

কোন ব্যক্তি এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালতের সামনে নির্যাতনের অভিযোগ করলে আদালত তৎক্ষণাৎ অভিযোগকারীর বক্তব্য লিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করবেন। তারপর আদালত অভিযোগকারীকে সমলিঙ্গের রেজিস্টার্ড ডাক্তার দ্বারা দেহ পরীক্ষার আদেশ দিবেন।[৯] নির্যাতনের ক্ষত ও চিহ্নসমূহ শনাক্ত করাসহ নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় নির্ণয় করে ডাক্তার ২৪ ঘন্টার মধ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।[১০] প্রতিবেদনের এক কপি আদালতে এবং অপর এক কপি অভিযোগকারী বা তার প্রতিনিধিকে দিবেন।[১১] অভিযোগ গ্রহণের পর আদালত মামলা দায়েরের আদেশ দিবেন এবং লিখিত বক্তব্যের একটি কপি পুলিশ সুপার অথবা প্রয়োজনে উর্ধ্বতন পুলিশ অফিসারের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন।[১২] এই আইন অনুযায়ী কোন তৃতীয়পক্ষ যিনি নির্যাতনের ঘটনা দেখেছেন তিনিও আদালতে অভিযোগ করতে পারেন। এ ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে

৬ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩, ধারা ২(৪)
৭ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫(১)
৮ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫ (২)
৯ প্রাগুক্ত, ধারা ৪(১)(সি)
১০ প্রাগুক্ত, ধারা ৪ (২)
১১ প্রাগুক্ত, ধারা ৪ (৩)
১২ প্রাগুক্ত, ধারা ৫ (১)

আদালত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে পারেন।[১৩] আবার, তৃতীয় কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষতিগ্রস্ত নন তিনিও দায়রা জজ আদালত বা পুলিশ সুপারের নিচে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে নির্যাতন সংঘটনের অভিযোগ করতে পারেন।[১৪] এই আইনের অধীনে যেকোন অপরাধের বিচার একমাত্র দায়রা জজ আদালতেই অনুষ্ঠিত হবে।

২.৪ নির্যাতনের অভিযোগ তদন্ত

অভিযুক্ত ব্যক্তির পদবির নিচে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তাকে আদালত তদন্ত কাজ পরিচালনার জন্য নির্দেশ দিবেন।[১৫] যদি নিরপেক্ষতার বিষয়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যুক্তি দেখান যে, পুলিশের পক্ষে যথাযথ তদন্ত কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয় তাহলে তিনি বিচারিক তদন্তের আবেদন করতে পারেন। বিচারিক তদন্তের আবেদনে বর্ণিত কারণসমূহে যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় তাহলে আদালত বিচারিক তদন্তের আদেশ দিতে পারেন।[১৬] অভিযোগ দায়েরের দিন থেকে ৯০ কর্ম দিবসের মধ্যে তদন্তকাজ অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। যদি যুক্তিসংগত কারণে তদন্ত কাজ বিলম্বিত হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তা আদালতে উপস্থিত হয়ে সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে এবং আদালত আবেদন মঞ্জুর করলে তদন্ত কাজ আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করতে পারেন।[১৭] তদন্তকারী কর্মকর্তা বা বিচার বিভাগীয় তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের সময়, অভিযোগকারী প্রতিবেদন পেয়েছেন কিনা এবং প্রতিবেদন পেয়ে থাকলে কত তারিখে পেয়েছেন তা আদালতকে জানাবেন।[১৮] সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে বা তার আইনগত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই ধরনের প্রতিবেদন গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে এর বিরোধিতা করতে পারবেন।[১৯]

২.৫ অভিযোগকারীর সুরক্ষা

২০১৩ সালের নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনের ১১ ধারায় অভিযোগকারীকে সুরক্ষা প্রদানের পদ্ধতি রয়েছে, যার আওতায় তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য দায়রা জজ আদালতে পিটিশন দায়ের করতে পারেন। পিটিশন গ্রহণ করে আদালত বিবাদীকে ৭ দিনের নোটিশ দিয়ে ১৪ দিনের মধ্যে পিটিশনটি অনুমোদন বা বাতিল করবেন। আদালত প্রয়োজন মনে করলে অভিযুক্তকে কমপক্ষে ৭ দিনের অন্তরীণের আদেশ দিতে পারেন এবং সময়ে সময়ে তা বৃদ্ধি করতে পারেন।[২০] আদালত নিজ বিবেচনায় অভিযোগকারীকে সুরক্ষা প্রদানের জন্য আদালতের স্থান পরিবর্তন এবং বিবাদীকে নির্দিষ্ট কোন এলাকায় প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা জারিসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

১৩ প্রাগুক্ত, ধারা ৬
১৪ প্রাগুক্ত, ধারা ৭(১)
১৫ প্রাগুক্ত, ধারা ৫(৫)
১৬ প্রাগুক্ত, ধারা ৫ (২)
১৭ প্রাগুক্ত, ধারা ৮
১৮ প্রাগুক্ত, ধারা ৫ (৩)
১৯ প্রাগুক্ত, ধারা ৫(৪)
২০ প্রাগুক্ত, ধারা ১১ (৪)

২.৬ নির্যাতনমূলক অপরাধের বিচার

এই আইনের আওতায় মামলা দায়েরের দিন থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে অবশ্যই মামলার বিচার সম্পন্ন করতে হবে। যদি যুক্তিসংগত কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে মামলাটির বিচার সম্পন্ন না হয়, তাহলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য অবশ্যই সম্পন্ন করতে হবে। এই আইন অনুযায়ী যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন, অর্থদন্ড বা ক্ষতিপূরণ জমা দেওয়া স্বাপেক্ষে তারা শাস্তির বিরুদ্ধে হাইকোর্টে ডিভিশন-এ আপিল করতে পারবেন। তাছাড়া সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উচ্চতর আদালতে আপিল এবং রিভিউও করতে পারবেন।[২১]

২.৭ বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন ব্যক্তি কর্তৃক সংগঠিত অপরাধ এবং বহিঃসমর্পন

বাংলাদেশের নাগরিক নন এমন কোন ব্যক্তি যদি এই আইনের আওতায় কোন অপরাধে গ্রেফতার হন তবে তিনি তার দেশের হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। যদি বাংলাদেশে তার দেশের হাইকমিশন না থাকে, তাহলে পাশ্ববর্তী দেশে তার দেশের হাইকমিশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।[২২] বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির দেশের কর্তৃপক্ষকে তার বিচারের জন্য বহিঃসমর্পনের অনুরোধ করতে পারেন। বাংলাদেশে নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত অন্য কোন রাষ্ট্রের নাগরিককে যদি তার দেশ বহিঃসমর্পন করতে অনুরোধ করে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ঐ ব্যক্তির বিচার বা বহিঃসমর্পন সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নিয়েছে বা নেওয়ার প্রস্তাব করছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে জানানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। নির্যাতনের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা রুজু করতে ঐ দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশ সরকার প্রাসঙ্গিক প্রমাণাদি সরবরাহ করতে পারেন। এই আইনের আওতায় বহিঃসমর্পনের বিষয়টি ১৯৭৪ সালের বহিঃসমর্পন আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে।

২১ প্রাগুক্ত, ধারা ১৬.
২২ প্রাগুক্ত, ধারা ১৭.

নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ -এর প্রয়োগ

২০১৩ সালের অক্টোবরে নির্যাতন বিরোধী আইনটি পাস হলেও হাতে গোনা কয়েকটি মামলা এই আইনের আওতায় দায়ের হয়েছে। দৈনিক প্রত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী পুলিশের নির্যাতনে নিহত মিরপুরের জুট ব্যবসায়ী সুজন হত্যা মামলা এই আইনে প্রথম দায়েরকৃত মামলা যা গত ২০ জুলাই ২০১৪ দায়ের করা হয়।[২৩] অথচ বিগত দুই বছর সারাদেশে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দ্বারা নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুর অনেকগুলো খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এই আইন সম্পর্কে সাধারণ জনগণ সচেতন নয়। আবার, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য কর্তৃক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্য সুনির্দিষ্ট ভাবে এই আইনটি থাকা স্বত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এই আইনের আওতায় মামলা আমলে নিতে গড়িমসি করেন। যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সিলেট কোতয়ালী থানার মামলা। এই ঘটনায় কোতয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ ৫ জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে জনৈক কালাম চৌধুরীকে গত ১৭ জুলাই ২০১৪ তারিখে গুরুতর নির্যাতনের অভিযোগ উঠে। নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মামলা গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি মহামান্য হাইকোর্টে রীট আবেদন করলে হাইকোর্ট গত ২৪ জুলাই ২০১৪ মামলা দায়েরের আদেশ প্রদান করেন। আদেশ প্রদানের ১০ দিন পর গত ৫ আগষ্ট ২০১৪ পুলিশ কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করেন।[২৪] সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এই ধরনের আচরণ এই আইনের প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

২৩ http://www.asia-observer.com/Template/news.php?news=Uk9XlgAdygxZ&&ac=Bangladesh
২৪ http://newagebd.net/37239/case-filed-against-5-cops-10-days-after-hc-order/

পর্যালোচনার ফলাফল

পর্যালোচনার ফলাফল নিচে দেওয়া হল -

৪.১ নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর সংজ্ঞা

এই আইনে নির্যাতনের সংজ্ঞাকে শুধুমাত্র তথ্য ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে এবং নির্যাতনের বহুমূখী ও জটিল বিষয়গুলোকে আওতাভুক্ত করেনি। আদালতের রিমান্ড আদেশে বা বিচারের অপেক্ষায় থাকা বন্দীদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অন্তর্ভুক্ত করতে এই সংজ্ঞা ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোন ব্যক্তি বা সরকারী কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের বিষয়টি এই সংজ্ঞায় অনুপস্থিত। এই সংজ্ঞা সুনির্দিষ্টভাবে নির্যাতন হিসেবে নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর দণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু, ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘের নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে প্রদত্ত নির্যাতনের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সম্পন্ন সংজ্ঞার প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। আবার 'মানসিক নির্যাতন', 'হেফাজত' ও এই আইনের অন্যান্য উপাদানের সংজ্ঞাগত অস্পষ্টতা এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগকে বাধাগ্রস্ত করবে। ফলে ঐ সকল উপাদানের সংজ্ঞা পরিস্কার হওয়া উচিত। পরামর্শ সভায় নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যুর সংজ্ঞায় বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকেও অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আবার নির্যাতনের ধরন হিসেবে ধর্ষণ, যৌন হয়রানিসহ অন্যান্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে আইনে উল্লেখ নেই।

৪.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা

আইনের ২(৪) ধারায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে যেখানে সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, দুর্নীতি দমন কমিশন এবং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যও আইন প্রয়োগ করে থাকে এবং এই সকল বিভাগের কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের কার্য সম্পাদনের সময় নির্যাতনের আশ্রয় নিতে পারে। তাদেরকে এই সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৪.৩ অভিযোগ দায়ের

এই আইনের অধীনে অপরাধের বিচার দায়রা জজ আদালতে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু আইনে অপরাধের আমলযোগ্য আদালত কোনটি তা স্পষ্ট বা সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। আবার যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি পুলিশ হেফাজতে থাকে তাহলে তিনি কীভাবে অভিযোগ দায়ের করবেন সে বিষয়েও কিছু বলা নেই।

৪.৪ তদন্ত

আইনে অপরাধ তদন্তের জন্য প্রাথমিকভাবে পুলিশের উপর দায়িত্ব প্রদান করেছে যদিও এই আইনে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পুলিশ কর্মকর্তাগণ অভিযুক্ত হবেন। ফলে এ ধরনের তদন্তের নিরপেক্ষতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন থাকবে। পুলিশী তদন্তের পাশাপাশি বিচারিক তদন্তের বিধান থাকলেও বিচারিক তদন্তকে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। যদি অভিযোকারী আদালতে বিচারিক তদন্তের আবেদন করেন এবং আদালত যদি যুক্তিসংগত মনে করে আবেদন মঞ্জুর করেন, কেবলমাত্র তখনি বিচারিক তদন্ত অনুষ্ঠিত হবে।[২৫] আবার পোস্ট মর্টেম করা এবং পোস্ট মর্টেম প্রতিবেদন সংগ্রহ করার প্রক্রিয়াও আইনে অনুপস্থিত। তদন্তের জন্য বেঁধে দেওয়া সময়সীমা নিয়েও প্রশ্ন আছে। আইনের ৮(১) ধারা অনুযায়ী অভিযোগটি প্রথম লিপিবদ্ধ করার সময় থেকে ৯০ কর্মদিবসের মধ্যে অবশ্যই তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে। তবে যুক্তিসংগত কারণে তদন্তের সময় আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করা যাবে। কিন্তু যদি বেঁধে সময়সীমার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন না হয় তাহলে কী ধরনের পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে তা আইনের কোথাও নির্দিষ্টভাবে বলা নেই। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তার অসদাচরণ বা যথাযথ তদন্ত করতে ব্যর্থ হলে আইনে তার জন্য কোন শাস্তির বিধান রাখা হয়নি।

৪.৫ বিচার

আইনের ১৪(২) ধারায় অভিযোগ দাখিলের তারিখ থেকে ১৮০ দিনের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্নের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। তবে আদালত যুক্তিসংগত কারণে অতিরিক্ত ৩০ দিন বৃদ্ধি করতে পারবে। কিন্তু যদি বেঁধে দেয়া সময়সীমার মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন না হয় তাহলে এই মামলার পরিণতি কী হবে সে বিষয়ে আইনে কোন স্পষ্ট বিধান নেই।

৪.৬ শাস্তি

আইনের অধীনে অপরাধগুলোর শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে ১৫(১), (২) ও (৩) ধারায়। তবে শাস্তি সংক্রান্ত আইনের ধারায় কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে।

১৫(২) ধারায় বলা হয়েছে;

> ‘কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে নির্যাতনকারী এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।’

২৫ প্রাগুক্ত, ধারা ১৭

এই আইনের অধীনে বিভিন্ন অপরাধের জন্য শাস্তির যে মাত্রা বা কঠোরতা প্রদান করা হয়েছে, তা ১৮৬০ সালের দণ্ড বিধিতে বর্ণিত একই ধরনের অপরাধের জন্য শাস্তির মাত্রা বা কঠোরতার প্রতিফলন করে না। আইনে শাস্তি প্রদান মূলতঃ কারাদণ্ড ও ক্ষতিপূরণের মাঝে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বরখাস্ত বা চাকুরীচ্যুত করাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা আইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তাছাড়া আইনে ভিকটিম/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান রাখা হয়েছে কিন্তু কীভাবে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হবে তার সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতির উল্লেখ নেই। অধিকন্তু, আইনে খুনের জন্য মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিধান রাখা হয়নি, ফলে কোন ভয়াবহ বা নৃশংস হেফাজতে মৃত্যু বা ক্রসফায়ার হলে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদানের সুযোগ নেই।

আবার ১৫ ধারার আরেকটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা হল, খুনের অপরাধ তখনি শাস্তিযোগ্য হবে যখন নির্যাতনের ফলে হেফাজতে মৃত্যু হবে। এই বিধান অন্যান্য বেআইনী কারণে বা যেখানে নির্যাতনের সাক্ষ্য-প্রমাণ অদৃশ্য এমন হেফাজতে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম প্রভাব ফেলবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুলিশ হেফাজতে বিষ প্রয়োগে মৃত্যুর পর ভিকটিমকে মানসিক নির্যাতনের প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

৪.৭ ক্ষতিপূরণ

এই আইনে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ একেবারেই অপর্যাপ্ত। অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি নির্যাতনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে পঁচিশ হাজার টাকা এবং নির্যাতনের ফলে মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত হয় তাহলে দুই লক্ষ টাকা ভিকটিম/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে। যদিও ২০০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ৬০/১৭০ রেজুলেশনের মাধ্যমে গৃহীত 'আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণের অধিকার সংক্রান্ত মৌলিক নীতিমালা ও নির্দেশিকা'-তে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এই আইনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরণ করা হয়নি।

২০ নং মৌলিক নীতিমালা ও নির্দেশিকায় বলা হয়েছে,

> "আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের গুরুতর লঙ্ঘন সংক্রান্ত প্রত্যেক ঘটনার পরিস্থিতি, যথার্থতা ও লঙ্ঘনের গুরুত্ব অনুপাতে অর্থনৈতিকভাবে নির্ধারণযোগ্য যে কোন ক্ষতির ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে, যেমন;
>
> ক) শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি
>
> খ) চাকুরী, শিক্ষা ও সামাজিক সুবিধাসহ হারানো সুযোগসমূহ
>
> গ) বস্তুগত ক্ষতি এবং উপার্জনের ক্ষতি

ঘ) নৈতিক ক্ষতি

ঙ) আইনগত ও বিশেষজ্ঞ সহযোগিতা, ঔষধ ও স্বাস্থ্য সেবা এবং মানসিক ও সামাজিক সেবা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খরচ।"

তাছাড়া ক্ষতিপূরণের অন্যান্য ধরন যেমন, ভিকটিমকে পুরোপুরি আগের অবস্থায় ফিরে আনা, পুনর্বাসন, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তুষ্টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সাথে যেন এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার নিশ্চয়তা আইনে প্রদান করা হয়নি যা এই আইনের বড় ধরনের বিচ্যুতি।

৪.৮ সাক্ষী সুরক্ষা

এই আইনের অধীনে অভিযোগকারীকে ১১ ধারা অনুযায়ী সুরক্ষা প্রদান করার বিধান রয়েছে। অভিযোগকারী দায়রা জজ আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সুরক্ষা চেয়ে পিটিশন দাখিল করতে পারেন। আইনের ১১(১) ও ১১(৪) ধারার মধ্যে বিরোধ বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ করে দেয়। ১১(১) ধারা অনুযায়ী অভিযোগকারী অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য 'পিটিশন' দাখিল করতে পারে। আবার ১১(৪) ধারায় বলা হয়েছে, "উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরনের কোন 'মামলা' নিষ্পত্তিকালে আদালত প্রয়োজনবোধে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যূন সাত দিনের অন্তরীণ আদেশ দিতে পারিবে এবং সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।" ১১(১) উপ-ধারায় বলা হচ্ছে 'পিটিশন' এবং ১১(৪) উপ-ধারায় বলা হচ্ছে 'মামলা', যা বিভ্রান্তিমূলক এবং তা দূর করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, এই আইনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানোর বিষয়কে আলাদা কোন অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি। এই আইনে সাক্ষী সুরক্ষার কোন বিধান সন্নিবেশিত হয়নি। নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু সম্পর্কিত অপরাধসমূহ ভয়ানক এবং কোন ব্যক্তি এ ধরনের নির্যাতন দেখে ফেললে সে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকে। সেজন্য নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ১৩ অনুচ্ছেদে সকল ধরনের অপব্যবহার ও ভীতি প্রদর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোকারী ও সাক্ষীর সুরক্ষা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। সাক্ষী সুরক্ষা বিধানের অভাব এই আইনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে খর্ব করবে।

৪.৯ অতিরাষ্ট্রীক এখতিয়ার

অতিরাষ্ট্রীয় সীমায় যেমন, বাংলাদেশের কোন জাহাজ বা বিমানে এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ সংগঠিত হলে তা আমলে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই আইন একেবারেই নিশ্চুপ। নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অতিরাষ্ট্রীয় সীমায় সংগঠিত কোন অপরাধ বিচারের এখতিয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পক্ষরাষ্ট্রসমূহ দায়বদ্ধ রয়েছে।

৪.১০ আপিল এবং রিভিশন

আইনের ১৬ ধারায় আপিল করার প্রক্রিয়া বলা হয়েছে কিন্তু আপিলের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি অর্থাৎ কতদিনের মধ্যে আপিল করতে হবে তার উল্লেখ নেই। আবার ১৬(২) ধারায় বলা হয়েছে, 'ভিকটিম/ সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ ব্যক্তিরাও আপীল অথবা রিভিউর জন্য উর্ধ্বতন আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারিবে'। বর্তমান আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'রিভিউ' শব্দটির স্থলে 'রিভিশন' শব্দটি প্রতিস্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। অন্যভাবে, আপিল ও রিভিশন আবেদনের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধি প্রয়োগ করার বিধান আইনে যুক্ত করা যেতে পারে।

সুপারিশ ও উপসংহার

নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩ একটি নতুন আইন যা বিশেষ ও অত্যন্ত সংবেদনশীল প্রকৃতির অপরাধ নিয়ে কাজ করে। এই আইনের ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে ব্লাস্ট বিভিন্ন আইন ও বিধি পর্যালোচনা করেছে। উক্ত পর্যালোচনার ফলাফলসমূহ ব্লাস্ট পাঁচটি বিভাগীয় শহরে আইনজীবী, আইনের শিক্ষক, মানবাধিকার কর্মী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের সাথে মতবিনিময় সভা করে। এই সকল সভায় আলোচকবৃন্দ মানবাধিকার ও স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিমালাকে সমুন্নত রাখতে এবং আইনের কার্যকর প্রয়োগের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রদান করেন।

৫.১ সুপারিশসমূহ

আইনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনায় অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রদান করেন-

- শুধুমাত্র তথ্যসংগ্রহ ও স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য নির্যাতনের মধ্যে নির্যাতনের সংজ্ঞা সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। নির্যাতন সংগঠিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল উদ্দেশ্য ও পরিস্থিতি সংজ্ঞায় অর্ন্তভূক্ত করা উচিত। তাছাড়া নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনে নির্যাতনের সংজ্ঞায় যে সকল উপাদান রয়েছে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের প্রতিফলন ঘটাতে তার সবগুলো উপাদান অর্ন্তভূক্ত করা উচিত।

- আইনে 'হেফাজত'-এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা হয়নি। এই আইনকে আরো ফলপ্রসু করতে 'হেফাজত' -এর একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাকা উচিত। 'সরকারী কর্মকর্তা' ও 'আদালত'সহ আরো কিছু সংজ্ঞা আইনে পরিস্কার করা প্রয়োজন। যেমন, সরকারী কর্মচারী (অবসর) আইন, ১৯৭৪-এর ২(ডি) ধারায় 'সরকারী কর্মচারী'র সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে।

- 'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'র সংজ্ঞায় সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আইন প্রয়োগে নিয়োজিত নিরাপত্তা বাহিনীসহ মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং দুর্নীতি দমন কমিশনকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

- এই আইনের অধীনে সকল অপরাধের জন্য আমলি আদালত নির্দিষ্ট করা উচিত যা বর্তমানে অস্পষ্ট। তাছাড়া পুলিশ হেফাজতে আটককৃত ব্যক্তি কর্তৃক নির্যাতনের অভিযোগ দাখিলের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

- আইনটিতে ময়না তদন্তের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য প্রেরণের প্রক্রিয়া এবং কীভাবে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে ও কে তা সংগ্রহ করবে এই সম্পর্কেও নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন।

- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য বিশেষ করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য অভিযুক্ত হতে পারে। কিন্তু আইনে অপরাধ তদন্তের জন্য প্রাথমিক ভাবে পুলিশকে দায়িত্ব প্রদান করে, যা নিরপেক্ষ তদন্তের বিশ্বাসযোগ্যতাকে সংশয়স্থ করবে। সেজন্য ৫(২) ধারা অনুযায়ী বিচার বিভাগীয় তদন্তকে বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করা হয়েছে। জেলা পুলিশের প্রশাসনিক তত্ত্বাবধায়নে নয় এমন একটি স্বাধীন তদন্তকারী সংস্থাকে এই আইনের অধীনে অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব দেয়ার সুপারিশও করা হয়েছে। এটাও সুপারিশ করা হয়েছিল যে, এই ধরনের অপরাধের তদন্ত করার জন্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট থেকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নির্বাচন করা। যেমন, সিআইডি পুলিশ অফিসারদের তদন্ত করবে বা পুলিশ অফিসার র‍্যাব অফিসারদের তদন্ত করবে। আবার তদন্ত কার্যক্রম ১২০ দিবসের নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে যদি শেষ না হয় তবে কোন কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা হবে সে সম্পর্কে নির্দেশনা দিতেও আইনের ৮ ধারা ব্যর্থ হয়েছে। ৮ ধারায় এ বিষয়ে সুনিদিষ্ট করা উচিত।

- আইনের ১৪ ধারা অনুযায়ী অপরাধের বিচার কাজ ২১০ কর্মদিবসের নিদিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ না হলে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করে বিচার কার্য সম্পন্ন হবে তার নিদের্শনা দেওয়া হয়নি। এই আইনের ১৪ ধারায় তা সুনিদিষ্ট করা উচিত।

- শাস্তি প্রদান সংক্রান্ত আইনের বিধানসমূহ[২৬] সংশোধন করা প্রয়োজন। প্রথমত, এই আইনের অধীনে অপরাধের জন্য যে শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে তা অপর্যাপ্ত এবং দণ্ডবিধিতে উল্লিখিত একই ধরনের অপরাধের জন্য প্রদত্ত শাস্তির সাথে পারস্পরিক সর্ম্পকহীন। দণ্ডবিধিতে বর্ণিত শাস্তির মাত্রা বা কঠোরতার সাথে সঙ্গতি রেখে একই ধরনের অপরাধের জন্য অনুরূপ শাস্তি নিশ্চিত করতে এই আইনের বিধানগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন এবং এই আইনে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তির বিভিন্ন ধাপ হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, ১৫(১), (২)এবং (৩) ধারায় বর্ণিত কারাদণ্ড এবং আর্থিক জরিমানার মাঝে 'বা' এর পরিবর্তে 'এবং' প্রতিস্থাপন করা সমীচিন। তৃতীয়ত, মৌলিক নীতিমালা ও নির্দেশিকার[২৭] ভিত্তিতে ভিকটিম/সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য বরাদ্দকৃত ক্ষতিপূরণের পরিমান বাড়ানো প্রয়োজন, যাতে করে এটি প্রকৃত ক্ষতি ও আইনগত অনিষ্ট হওয়ার সমানুপাতিক হয়। তাছাড়া, নেগোশিয়েবল ইন্ট্রুমেন্ট অ্যাক্ট, ১৮৮১ এবং নারী এবং শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর মত এই আইনেও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের সুনিদিষ্ট পদ্ধতি থাকা উচিত। ক্ষতিপূরণের অর্থ যোগান একটি উদ্বেগের বিষয় যা আইনে অনুপস্থিত। কোন কোন দেশে যদি অন্য কোন উৎস থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থের যোগান না হয় তাহলে

২৬ প্রাগুক্ত, ধারা ১৫ (১), (২) ও (৩)

২৭ Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law' adopted and proclaimed by General Assembly on 16 December 2005

রাষ্ট্রের রিজার্ভ থেকে এই অর্থ দেওয়া হয়। এই ধরনের বিধান এই আইনেও সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

- আর্থিক জরিমানা ও কারাদণ্ড ছাড়াও দোষী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদেরকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত এবং ভবিষ্যতে অন্য কোন সরকারি ও বেসরকারি চাকুরিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করার মত অতিরিক্ত শাস্তিও যুক্ত করা যেতে পারে।

- আইনের উদ্দেশ্যকে সমুন্নত রাখতে সাক্ষী সুরক্ষার বিষয়টি সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সাক্ষী সুরক্ষার বিষয়টি যুক্ত করে আইনের সংশোধন করা উচিত।

- নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের ৫(১) অনুচ্ছেদের সাথে সংগতি রেখে এই আইনে অতিরাষ্ট্রীক এখতিয়ার অর্থাৎ বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ ও বিমানকে আইনের এখতিয়ারভুক্ত করে আইনটি সংশোধন করা উচিত।

- আইনের ১৬(২) ধারায় 'রিভিউ' শব্দের পরিবর্তে 'রিভিশন' শব্দটি প্রতিস্থাপন করে বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আইনের সংশোধন প্রয়োজন।

৫.২ উপসংহার

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ২০১৩ সালের অক্টোবর মাসে 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়নের মাধ্যমে এক মাইলফলক অর্জন করেছে। এই আইন পাসের আগে, সরকারী কর্মচারীদের বিশেষ করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের হেফাজতে নির্যাতনের ঘটনা বিচারে কিছু বাধা ছিল। নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা প্রতিরোধে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে এই আইন প্রথম ও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আইনের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এই আইন প্রণয়নকে একটি অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে এবং মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীগণ এটিকে স্বাগত জানিয়েছে। এই পর্যালোচনায় প্রাপ্ত সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে আইনটির কার্যকর প্রয়োগের জন্য অতিশীঘ্র সংশোধন করা প্রয়োজন। নির্যাতন মুক্ত একটি সমাজ গড়তে জনগণকে এই আইন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য প্রচারাভিযান করা এবং বিচারক, আইনজীবী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং মানবাধিকারকর্মীদেরকে এই আইনের বিধানসমূহ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি, এডভোকেসী ও জুডিশিয়াল এক্টিভিজমের মাধ্যমে আইনের বাস্তব প্রয়োগ বৃদ্ধি করা অতীব জরুরী।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দেশের শীর্ষস্থানীয় জাতীয় আইন সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয় ছাড়াও দেশের ১৯টি জেলা শহরে ব্লাস্টের শাখা কার্যালয় রয়েছে। ব্লাস্ট এর লক্ষ্য হচ্ছে দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগণকে আইন সহায়তা প্রদান, ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধন এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এমন একটি পরিবেশ নিশ্চিত করা যা তাদের প্রতি সহানুভূতি, নিরপেক্ষ, বন্ধুসুলভ ও আধুনিক। আইন সহায়তার পাশাপাশি ব্লাস্ট PIL ও Advocacy এর মাধ্যমে নীতি নির্ধারণ, আইন প্রণয়ন, সংস্কার সাধন এবং বিচার ব্যবস্থার আধুনিকায়নের মাধ্যমে সকলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে এমন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন সাধন করার লক্ষ্যে ব্লাস্ট নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে:

ক) বিনামূল্যে আইন সহায়তা ও সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি: ব্লাস্ট বিনামূল্যে আইনগত পরামর্শের পাশাপাশি নির্যাতিত, অসহায় ও গরীব মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সালিশের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি ও বিনামূল্যে মামলা পরিচালনা করে। নারী নির্যাতনের মামলাসহ পারিবারিক, যৌতুক, বহুবিবাহ, শ্রম, দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলাসমূহ পরিচালনা করে। অপরদিকে, প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশের যেকোন স্থান থেকে পাঠানো গরীব ও অসহায় মানুষের মামলাসমূহ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট এবং আপীল বিভাগে বিনামূল্যে পরিচালনা করা হয়।

খ) তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত: ব্লাস্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক বিভিন্ন ঘটনার তথ্যানুসন্ধান বা তদন্ত একক এবং যৌথভাবে পরিচালনা করে। এছাড়া পারস্পারিক অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময়, যোগাযোগ বৃদ্ধি ও সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

গ) সচেতনতা কার্যক্রম: ব্লাস্ট স্থানীয় গরীব, অসহায় জনসাধারণ, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বিশেষ করে শ্রমিক ও বস্তিবাসী মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ সচেতনতা কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য হল দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে জানানো এবং সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিচার প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম: ব্লাস্ট অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক-এর মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধি, প্যানেল আইনজীবী, স্টাফ, শ্রমিক, কারখানার মধ্য-পর্যায়ে সালিস, দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় আইন, শ্রম আইন, জেন্ডার, মানবাধিকার, নারীর অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

ঙ) জনস্বার্থ মামলা (PIL): ব্লাস্ট ১৯৯৪ সাল থেকে জনস্বার্থ মামলা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত ব্লাস্ট ৮৪টি জনস্বার্থ (PIL) মামলা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো - প্রতিবন্ধীদের চাকুরীর সুযোগ, অবৈধভাবে বস্তি উচ্ছেদ রোধ, অবৈধ জমি অধিগ্রহণ রোধ, স্থানীয় সরকার যেমন - গ্রাম সরকার ও গ্রাম পরিষদ আইনের বৈধতা, ক্ষতিপূরণ আদায়, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা অপপ্রয়োগ রোধ, বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ড প্রতিরোধ, সরকারী চাকুরীতে নারী-পুরুষ বৈষম্য রোধ, পরিবেশ রক্ষা, ভোক্তা অধিকার, বিনাবিচারে আটক বন্দীদের মুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রামে ডিস্ট্রিক্ট, সেশন কোর্ট এবং পারিবারিক কোর্ট স্থাপন, সালিসের নামে বেআইনী সাজা বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তির নামে শিশুদের নির্যাতন বন্ধ সংক্রান্ত মামলা।

চ) অধিপরামর্শ (Advocacy): মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী, আইন ও পুলিশির সংশোধন, পরিবর্তন, বাস্তবায়নের জন্য ব্লাস্ট অধিপরামর্শমূলক কর্মসূচী পরিচালনা করে। ব্লাস্ট একদিকে সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন আইন, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকারসহ বিভিন্ন অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করছে। অপরদিকে বারের আইনজীবী, সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী ও বেসরকারী কর্মকতা, বিচার বিভাগের প্রতিনিধি ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের সংবেদনশীল এবং সচেতন করাসহ বিভিন্ন আইন ও নীতি বিষয়ে গবেষণা, জরিপ, সভা, ওয়ার্কশপ, সংলাপ ও সেমিনারের মাধ্যমে মতামত বা সুপারিশ সংগ্রহ করে।

ছ) ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়্যাল সিচুয়েশন অব ওভারক্রাউডিং ইন প্রিজনস প্রকল্প: ব্লাস্ট দেশের কারাগারের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে GIZ এর সহায়তায় এ প্রকল্পের আওতায় বগুড়া জেলার কারাগারের কাজ করছে এবং বিনা বিচারে আটক বন্দীসহ অসহায়, আর্থিকভাবে অসচ্ছল বন্দীদের মুক্তির জন্য আইন সহায়তা প্রদান করছে।

জ) প্রমোটিং জেন্ডার জাস্টিস থ্রু লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্ট অব লোকাল কমিউনিটি ইন রুরাল বাংলাদেশ প্রকল্প: ব্লাস্ট Diakonia এর সহায়তায় ৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিরোজপুর, দিনাজপুর, যশোর এবং কুমিল্লা জেলার ৪ ইউনিয়নের ৩৬টি ওয়ার্ডের তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়ন ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় সালিসের মাধ্যমে বিরোধ নিস্পত্তি, সচেতনা কার্যক্রমসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

ঝ) গবেষণাকর্ম, আইন বিষয়ক পুস্তিকা, প্রতিবেদন, আইনগ্রন্থ এবং বুলেটিন প্রকাশ: ব্লাস্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম, বুকলেট, লিফলেট, বুলেটিনসহ আইন বিষয়ক পুস্তক প্রকাশ করে। এছাড়া ব্লাস্টের কার্যক্রম এবং ইস্যুভিত্তিক একটি ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হয়।

সিএইচআরআই এর কার্যক্রমসমূহ

সিএইচআরআই কাজ করছে প্রধানত কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহে। সিএইচআরআই বিশ্বাস করে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনে গণতন্ত্র, উন্নয়ন ও মানবাধিকারের বাস্তব প্রয়োগ ঘটাতে হলে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল কর্মকান্ডে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহন প্রয়োজন। একই সঙ্গে প্রয়োজন এ সব কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা। অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করতে মানসম্মত কার্যকর কাঠামো থাকতে হবে। এই বিশ্বাসই সিএইচআরআই এর সকল কার্যক্রমের ভিত্তি। সে আলোকেই মানবাধিকার বিষয়ে ব্যাপকভিত্তিক এডভোকেসির পাশাপাশি সহজে তথ্য জানার অধিকার এবং বিচার প্রক্রিয়ায় সাধারণ মানুষের অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য সিএইচআরআই কাজ করছে। সিএইচআরআই এর কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গবেষণা, প্রকাশনা, কর্মশালার আয়োজন, পারস্পরিক জ্ঞান ও তথ্য বিনিময় এবং এডভোকেসি।

মানবাধিকার এডভোকেসি কর্মসূচী:

কমনওয়েলথ এর আনুষ্ঠানিক দপ্তরসমূহ এবং কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সরকারসমূহের কাছে সিএইচআরআই নিয়মিত মানবাধিকার বিষয়ক স্মারকলিপি জমা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সিএইচআরআই বিভিন্ন স্থানে তথ্যানুসন্ধান দলও প্রেরণ করে। ১৯৯৫ সাল থেকে সিএইচআরআই নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, ফিজি দ্বীপপুঞ্জ এবং সিয়েরা লিয়নে মিশনে পাঠিয়েছে এবং কমনওয়েলথ হিউম্যান রাইটস্ নেটওয়ার্ক এর সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেছে। এ ছাড়া সিএইচআরআই এর মিডিয়া ইউনিট ও মানবাধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা অব্যাহত রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে।

তথ্য জানার অধিকার:

তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষায়িত জ্ঞান ও কৌশলগত দক্ষতা রয়েছে সিএইচআরআই এর। এ বিষয়ে ফলপ্রসু আইনগত কাঠামো গড়ে তুলতে এবং অনুসরণমূলক কোন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সিএইচআরআই সহযোগী সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দেশের নাগরিক সমাজ এবং সরকারের সহায়কের ভূমিকায় কাজ করে। এসব কর্মকান্ডের লক্ষ্য হলো তথ্য অধিকার বিষয়ক কাজে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং নীতি নির্ধারকদের তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা।

সিএইচআরআই দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

সম্প্রতি তারা ভারতে তথ্য অধিকার আইন পাসের উদ্দেশ্যে একটি সফল প্রচারাভিযান পরিচালনা করছে। তাছাড়া অতি সম্প্রতি তারা এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে তথ্য অধিকার বিষয়ক আইনের খসড়া তৈরীতে সহায়তা দিয়েছে। তথ্য অধিকারের স্বপক্ষে ভূমিকা রাখতে এ অঞ্চলের জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠনগুলোর সাথে সিএইচআরআই অনুঘটকের ভূমিকা ও পালন করছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় অভিগম্যতা:

পুলিশ বাহিনীর সংস্কার

অনেক দেশেই পুলিশ নাগরিকদের রক্ষাকারী না হয়ে রাষ্ট্রের নির্যাতনমূলক একটি হাতিয়ার হিসেবে অবতীর্ণ হচ্ছে। ফলে ঐ সকল দেশে অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপক ঘটনা ঘটে এবং বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয় অনেক মানুষ। সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর দর্শনগত ও পদ্ধতিগত সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। সিএইচআরআই মনে করে এ প্রক্রিয়াতেই কেবল পুলিশ তার বর্তমান নির্যাতনমূলক ভূমিকার পরিবর্তে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। ভারতে সিএইচআরআই মূলত পুলিশ বাহিনীর সংস্কারের স্বপক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধি ও জনগণকে সংঘবদ্ধ করার জন্য কাজ করছে। পূর্ব আফ্রিকায় এবং গায়নায় সিএইচআরআই পুলিশ বাহিনীর জবাবদিহিতা এবং তাদের কার্যক্রমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

কারা সংস্কার

ঐতিহাসিকভাবে কারা অভ্যন্তরে যে গোপানীয়তার সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে স্বচ্ছতার পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং সেখানকার দুর্নীতি ও অন্যায়গুলো জনসম্মুখে তুলে ধরাই হলো সিএইচআরআই এর কর্মসূচির মূল বিষয়। এক্ষেত্রে অন্যতম একটি কার্যক্রম হলো, কারাগারগুলোতে ধারণ ক্ষমতার চেয়ে কারাবন্দিদের যে আধিক্য তা কমাতে বিদ্যমান আইনগত সীমাবদ্ধতার প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করা। তাছাড়া প্রায় নিষ্ক্রিয় ও অকার্যকর কারা পরিদর্শন ব্যবস্থাকে সক্রিয় করে পরিস্থিতির উন্নতি সাধন করাও সিএইচআরআই এর মনোযোগের আরেকটি ক্ষেত্র। সিএইচআরআই মনে করে, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে কারা প্রশাসনের সেবার মানোন্নয়নে পরিবর্তন আনা যেমন সম্ভব তেমনি বিচার প্রশাসনেও একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলা সম্ভব।

This book has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this book are the sole responsibility of BLAST and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

এই প্রকাশনাটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রকাশিত হয়েছে। এখানে প্রকাশিত সকল মতামত ব্লাস্টের নিজস্ব এবং কোনভাবেই তা ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচিত হবে না।

Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)
1/1 Pioneer Road, Kakrail, Dhaka 1000, Bangladesh
Phone: +88 02 8391970-2, 8317185
Fax: +88 02 8391973, Email: mail@blast.org.bd
Web: www.blast.org.bd

Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI)
55/A Siddhartha Chambers, Kalu Sarai, New Delhi-110016
Phone: +91 11 43180200, 43180201
Fax: +91 11 26864688
Email: info@humanrightsinitiative.org
Web: www.humanrightsinitiative.org

Delegation of the European Union to India
49, Sunder Nagar, New Delhi - 110003
Phone: +91 11 42195219
Fax: +91 11 41507206 - 07
Web: http://eeas.europ.eu/delegations/ondia/index_en.htm

The contents of this report are the sole responsibility of BLAST and CHRI and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union. This publication has been produced with the financial assistance of the European Union. The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders.